পঞ্চম অধ্যায়

শেখর দাশের উপন্যাস বীক্ষার পরিণত পর্যায় : 'বিন্দু বিন্দু জল'

শুধুমাত্র বরাক উপত্যকার সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে শেখর দাশের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সমস্ত দিক দিয়ে অবহেলিত বরাক উপত্যকার মানুষের মানদণ্ড যেখানে নড়বড়ে সেখানকার সাহিত্যচর্চা যে অনেক পিছিয়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে উপন্যাস বীক্ষায় কবিতা ও গল্পের তুলনায় এ অঞ্চল অনেক পিছিয়ে। তবু বলা যেতে পারে যে, এই উপত্যকায় মননশীল বেশ কিছু উপন্যাস লক্ষ্য করা যায়। জীবনের আলো-আঁধারি জীবিকা নির্বাহ করতে করতে ছোট আকারের কবিতা বা গল্প লেখা হয়তো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বড় কথাসাহিত্য রচনা বা তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে লেখককে অনুপ্রাণিত করা বেশ জটিল। প্রতিটি মানুষই প্রতিকূল পরিবেশে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে ব্যস্ত। সাহিত্য যেহেতু সামাজিক ও সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে তাই সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা সেখানে বিপন্ন, আত্মবির্নিমাণের শেষ বিন্দুটুকু যেখানে অনুপস্থিতি সেখানে কথাসাহিত্যিকগণ তাদের কথার কড়চা শুধু নিজের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখেন, দেশভাগ, দাঙ্গা, মহামারি, ভাষা আন্দোলন বরাক উপত্যকার মানুষের জীবনযাত্রা একের পর এক আঘাতে পর্যদুস্ত, যদিও যুদ্ধকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা দুটি মহাকাব্য এর মধ্যে আমরা পেয়ে গেছি। কাব্যে দেশভাগের মতো করুণ পরিণতি, বাস্তুহীনতার অভিশাপ, হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অস্বীকৃতি, দ্বিজাতিতত্ত্বের মেকি ইতিহাসের বিষবাষ্প আমরা দেখতে পাইনি। দেশভাগের করুণ, মর্মান্তিক দহন, বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতি তা যে কোনো বড় যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির সমান। রামায়ণ, মহাভারত যুদ্ধকেন্দ্রিক দুটি মহাকাব্য হয়তো আমরা পেয়েছি

তবু এই যুদ্ধে অনেক মৃত্যু, বিনাশ রক্তপাত থাকলেও দেশভাগের মতো জন্মভূমি ত্যাগ এর করুণ যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা বা উদ্বাস্তু পদবি ছিল না। কিন্তু দেশভাগের প্রভাব সাহিত্যে যতটা প্রতিফলিত হবার কথা ছিল ততটা হয়নি। আমাদের কথাসাহিত্যিকেরা হতচকিত হয়ে পড়েছিল। দেশত্যাগ এর যন্ত্রণা, দাঙ্গা, দ্বিজাতিতত্ত্বের অমানুষিক অত্যাচারে নিজেরা দেশত্যাগের মিছিলে অংশীদার না হলে অনুভবের কমতি বোধ হয়; দেশবিভাগের ওপর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস রচনার প্রধান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল।

দেশত্যাগের অভিশাপ, সর্বগ্রাসী শূন্যতা, নিরাপত্তার অভাব, অন্ধকার ভবিষ্যৎ, স্বজনহারা মানুষের একাকিত্ব দেশবাসীকে নির্বাক করে দিয়েছিল, তাদের অকথিত বাণী বাংলা সাহিত্য স্থান পেল না। ১৯৪৭-৪৮ এ পূর্ববঙ্গ থেকে দেশত্যাগ শুরু হয়েছিল, আর তা চরমে ওঠেছিল ১৯৫০ এর জানুয়ারি থেকে৷ ১৯৫০ এর নভেম্বর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণ দেশভাগ-দেশত্যাগ অনুভব করার সময়টুকু তাঁকে দেওয়া হয়নি। যদিও তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের নন, আর যারা পূর্ববঙ্গ ছিলেন লেখাপড়া জীবিকা ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি কলকাতার মধ্যেই জড়িয়ে ছিলেন। ফলে পূর্ববঙ্গের হয়েও নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু ও সমরেশ বসুর মতো লেখকের সাহিত্যে দ্বিজাতিতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং হানাহানি উঠে আসেনি। যদিও তাদের সাহিত্যে ফুটে উঠেছে নস্টালজিয়া, হারানো শান্তি ও মৈত্রীর স্মৃতি৷ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' এদিক থেকে অসাধারণ দেশভাগ বাঙালির সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ, আজও বাঙালি এই অভিশাপ ও পাপ থেকে মুক্তি পায়নি। এই পাপ খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে জাতির সভ্যতা নিরীহ মানুষের জীবন আজও অতীতের বিষজ্বালায় জর্জরিত। যা ইতিহাস সাক্ষী দেয়। শুধু উপাধি পাল্টে যাচ্ছে যুগের সাথে। পূর্বে উদ্বাস্তু

বর্তমানে বাংলাদেশী বা ডি-ভোটার। ধর্মীয় উন্মাদনার তাণ্ডবে অভিন্ন ও মূল অস্তিত্ব সংস্কৃতির বাস্তবতা হারিয়ে গেল বাঙালির জীবন থেকে। যেখানে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ় অতিবাহিত হয় সেই জন্মভূমিকে ত্যাগ করা। জন্মভূমিকে ত্যাগ করার মতো দুঃখ-কষ্ট যে কতটা বেদনাদায়ক তা আর দ্বিতীয় কোনওকিছুতে নেই। প্রদীপ সরকারের মতো লক্ষ লক্ষ বাঙালির বুকের ভিতর থেকে দেশত্যাগ মানেটা 'দেশভাগ'। প্রিয় জিনিসের উপর থেকে নীরবে অধিকার হারানো। 'দেশভাগ' মানে হঠাৎ অসহায় হয়ে যাওয়া, নীরবে চোখের জল ফেলা ছাড়া বাকি সবকিছু অর্থহীন।' (দেশভাগ-দেশত্যাগ, সংকলন ও সম্পাদনা প্রসূন বর্মন, উৎখাত, প্রদীপ সরকার, পৃঃ ২২৫)

দেশভাগের মতো অভিশাপ মানুষের জীবনের আশা, আকাঙক্ষা, আত্মসম্মান সবকিছুই বিপন্ন। এত কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রখরতায় মেয়েদের সম্মান যেখানে অনিশ্চিত, সন্তানের প্রাণ যেখানে সংকটময় সেখানে স্পর্ধা করে সবাই কবি শামসুর রাহমানের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে পারি না—

"আমার ভূভাগ থেকে আমাকে উৎখাত করার জন্য
কত পাইক পেয়াদ চতুস্পর্শে অবিরল যাচ্চে বয়ে
লাভাস্রোত, কম্পমান ভূমি, প্রলয়ে হইনি পলাতক,
নিজস্ব ভূভাগে একরোখা এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ
আমার অহংকার।"[১]

মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পশুকে বার বার অনতিক্রম্য জেনে জীবনের প্রান্তসীমানায় এসে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে, প্রবল আক্ষেপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছিল— 'হায়রে মানুষ'।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় দেশভাগ লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত সমুদ্রে স্নান করে স্বাধীনতার এমন আলো দেখা দিল, যে আলো আঁধারের

অধিক৷ এমন স্বাধীনতা এলো— যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিলো। শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টিগোচরটুকু হলো না— হায়রে স্বাধীনতা। কবি ভাষায়—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে পারে!"

অন্যদিকে দেশভাগের ক্ষত দিনদিন শুধু বেড়েই চললো। বিভাজনের অভিশাপে শতশত মানুষ স্বাধীনতা হারিয়েছে। পরাধীনতার গ্লানি প্রতিনিয়ত তাদের গ্রাস করে। ১৯৪৭ এর দেশবিভাজন বাঙালির বাসভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করলো। তপোধীর ভট্টাচার্য দেশভাগ বাঙালির আত্মপরিচয় ও পরিণাম উল্লেখ করেছেন এভাবে—

> *"বাঙালির বসত মানে ছাউনি। সেই চর্যাপদের আমল থেকে৷ কিংবা তারও আগে। বারবার বসত ভাঙে বারবার বসত গড়ে৷ স্রোতে ভেসে যায় শ্যাওলার মতো। কখনো মাৎস্যন্যায়ে পোড়ে, কখনো উলুখা গড়ার ভূমিকা নেয় রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে। এভাবে দশকের পর দশক গেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী। নিজের ইতিহাসের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, শক্ত মুঠোয় ধরতে পারে না ভূগোলকেও। বাঙালি আসলে ইতিহাসে বন্দি ভূগোলের বর্জ্য। নইলে হাজার বছরের অভিন্ন ইতিহাস এবং ভূগোলকে ধর্মীয় পরিচয়ের উন্মাদ নেশায় ছিন্নভিন্ন করে কোন জাতি?"*
> ২

পাঁচ বছর যেতে না যেতে বাঙালি কূটিল ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতারণাকে বুঝতে পারল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার পরিচয় সবচেয়ে বড়

হিসাবে উঠে আসে। বাকি সব মেকি এবং আধিপত্যবাদ। শহিদ দিবস বাঙালির সর্বজাগরণ ঘটিয়েছিল বলে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম হলো। যেখানে বাংলা ভাষাই প্রধান বলে গণ্য হয়।

"ভয় দেয় উদাসীন জল
মানুষের স্মৃতিও তরল
বারে বারে করো ভিৎহারা?
সকলেই আছে বুকজলে
কেউ জানে কেউ বা জানে না
আমাকে যে সহজে বোঝালে
প্রণাম তোমাকে বৃষ্টিধারা।"[৩]

কবির ভাষা ও ভাবনায় নিষ্ঠুর সত্য বাঙালি বারে বারে ভিতহারা ও সময়ের পরিহাসে শুধু উপাধি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। আজও মনের গভীরের উৎকণ্ঠা ও নিষ্ঠুর বাস্তবের হাতছানি দিয়ে দেশভাগ বারে বারে ফিরে আসে মনের আঙ্গিনায় দেশের ক্ষমতালোভী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেদিন দেশের দু-জাতির মানুষকে প্রতারিত করেছে 'স্বাধীনতা' শব্দ ব্যবহার করে। আর বিশেষ ভাবে বাঙালি নিজ জন্মভূমিতে প্রবাসী হয়ে পড়েছে। শাশ্বত মর্মবাণী 'বনেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, মায়ের আঁচল সন্তানেরা সবচেয়ে নিরাপদ ও সুন্দর স্বাভাবিক প্রেমপূর্ণ জীবন গাঁথা থাকে৷ যা মাতৃহারা সন্তানের ভাগ্যে জুটে না সৎমা জন্মদায়ী মায়ের অপূর্ণতা কোনোদিন সার্থকভাবে পূর্ণ করতে পারে না। সেদিনের দ্বিজাতিতত্ত্ব বাঙালি বোঝেনি জন্মভূমিকে ত্যাগ করার মতো কঠিন কাজটা অতি সহজে মুষ্ঠিমেয় কতকগুলি আধিপত্যের লোভে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন-স্বপ্ন-ভাবনা নিয়ে পুতুল খেলা খেলেছিল। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়াটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় দেশের বুড়ো খোকাদের নির্মম ও অমানবিক খেলায় বাঙালির জীবনের মূল্যবোধ—

"তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যেসব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো, তার বেলাতে?"[৪]

চিরস্থায়ী হৃদয়ের গভীরে রক্তক্ষরণ ও প্রতিকারশূন্য ক্ষত ভিতরে ও বাইরের জন্মভূমির স্বাদ মানুষকে স্মৃতির গ্রন্থনায় ফিরে নিয়ে যায়। দেশভাগের চরম দুর্গতির তাপ সাহিত্যকেন্দ্রিক কলকাতায় শুধু লেগেছিল। তার ভয়াবহতার বিষ বোঝার উপলব্ধি তাদের ছিল না। ফলে উদ্বাস্তু অভিধা অর্জন করে চিরকালের মতো নিরাপত্তা-বিশ্বাস-ঐতিহ্য-মূল্যবোধ হারিয়ে নিঃস্ব পূর্ববঙ্গের বাঙালির করুণ গাঁথামালা। কবির ভাষায়—

"তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তু ভিটার
ভগ্নস্তুপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
অবুঝ কিন্তু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।"[৫]

স্বাধীনতা এলো লক্ষ লক্ষ মানুষের বহু প্রজন্মের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে। যা আজও আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার নগ্নচিত্র দেখতে পাই। ধর্মের নামে মানবসমাজে সাতচল্লিশের বীজ ও ডালপালা বিশাল বৃক্ষরূপ ধারণ করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অঅমরা আজও এর অর্থ খুঁজি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭ দেশভাগ, ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন, আর ১৯৭১ এর নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টির অস্থির ও উদ্ভুত পরিস্থিতি ক্রমশ ব্যাপ্ত হয়। সিলেট রেফারেন্ডাম, দেশভাগ এবং বাংলাদেশ সৃষ্টি পর্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের

উপর অকথ্য অত্যাচার, নৃশংস হত্যা, বাস্তুচ্যুতি, এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় শিশু-বৃদ্ধ-বণিতার প্রাণভয়ে জন্মভূমি ছেড়ে পালানোর কাহিনি, এর মর্মবেদনা বড়ো অসহনীয়। যন্ত্রণার গাঁথা বাংলা সাহিত্যে তেমন বড়ো মাপের উদ্দীপক হয়ে উঠল না। বহুমাত্রিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া নিয়ে মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনা হতে পারত৷ আসলে 'কু'-এর এত দাপট বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিতির নীরব বয়ান শুধু হৃদয়ের ভিতরে স্মৃতিগুলোকে উঁকি মেরে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে। এ প্রসঙ্গে এডোর্নোর বিখ্যাত বক্তব্য আমাদের মনে পড়ে যায়— **"Writting poetry is barbaric after Auschwitz."**

হিরোসিমায় পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ। অ্যাসচুইজের অভিজ্ঞতা সাহিত্যিকের কল্পনা ও কাব্য-শক্তিকে অসাড় করে দেয়। ফলে এইসব উপলব্ধি থেকে বড়োমাপের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। যারা ভুক্তভোগি তাদের চিন্তা-ভাবনা অকল্পিত ঘোর কালো পাপের লম্বা হাত বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল। এত বর্বরতা, তান্ডব, জ্বালা-যন্ত্রণা বিশ্রী-কালো সত্য লিখতে হয়তোবা তাদের হাত শীতিল হয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশে-ইতিহাসের পাতায় জ্ঞানী-গুণীজন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা সেই মোগল আমল থেকে৷ বাংলায় রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবেকানন্দ তো ভারতবর্ষে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের যুগল সাধনা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত বাণী দেশভাগের পটভূমিকায় জ্ঞানীজন কেন বা ভুলে গেলেন—

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' সমস্যা ও সম্ভাবনার সংঘাত অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্বাস্তুর মতো এক জটিল মানবিক সমস্যার জন্ম দিল। মফিদুল হক 'সম্প্রদায়ের বিভাজন এবং মিলনের পথানুসন্ধান' প্রবন্ধে বলেছেন—

"সমস্যার প্রকাশ হিসেবে ভারতের দুই প্রান্তের এই

দুই ভূমি রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের বংশ পরম্পরার জীবনপ্রবাহ রুদ্ধ অথবা গতিহারা হয়েছে এবং শেকড়সহ উৎপাটিত হয়ে দেশান্তরী হয়েছে বিশাল জনগোষ্ঠী। সেই হিংস্র ও রক্তাক্ত উত্থান একসময়ে নিস্তেজ হয়ে এলেও মাঝে মধ্যেই তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং পীড়ন ও সংঘাতের অন্তঃসলিলা প্রবাহ কখনোই বিলীন হয়ে যায়নি।"[৬]

আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আর কোনদিন যাবেও না। কারণ মানুষের বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ত্যাগ করার চেয়ে জন্মভূমি বা মৃত্যুবরণ করা অনেক শ্রেয়। জীবনের আলোময় স্বপ্ন প্রজন্মের পর প্রজন্মের বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি বাঙালি। আত্মমর্যাদা স্বপ্ন থেকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

আর এভাবেই দেশভাগ। পূর্ববাংলায় ধর্মের নামে অত্যাচার-শোষণের বর্বরতা, জন্মভূমি থেকে উৎখাত হবার যন্ত্রণা যে শিকড়ের সংকট তৈরি করেছে, আত্মপরিচয়ের গভীর শোক বিভাগোত্তর, বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন নন্দনের বয়ানে পাঠক সমাজের কাছে প্রতীয়মান হয়ে উঠে।

দেশভাগের প্রেক্ষিতে রচিত বাংলা কথাসাহিত্যে বহুস্বর ও দেশত্যাগের প্রধান কারণ যে দ্বিজাতিতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড়-শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭) উপন্যাসে উঠে আসে—

"শুনছেন মণ্ডল-দেশ ভাগ হতিছে।
'সে আবার কি?'
'হাঁ, একভাগ হিঁদুর, আর একভাগ মোসলমানের।'
'ভাগ কে করে? ইংরেজ ? তার নিজের জন্য কি

রাখবি?'

রামচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠল

'কী আবার রাখবি? মনে কয়,

ঘাসের জমি পত্তন দিতেছে।

মনে কয়, বিলেতে বসি খাজনা পাবি।' "[৭]

প্রবোধ সান্যালের উপন্যাস 'হাসবানু' (১৯৪৮-৪৯) প্রতিভা বসুর 'সমুদ্র হৃদয়ে'র মতো অঙ্গুলিমেয় গল্প উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আমরা পাই। এরপর সত্তর দশক পর্যন্ত দীর্ঘদিন দেশভাগের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস রচিত হয়নি।

বাঙালির ঐতিহ্য এক এবং অভিভাজ্য, তবে রাজনৈতিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা ভিন্ন ও সময়ের ইন্ধন অঞ্চল ভেদে গতির তারতম্য উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিচিত্র উচ্চাবচতা দেখা যায়। আমরা একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অসাধারণ ও প্রকৃত সন্দর্ভের আকরণ 'চিলেকোঠার সেপাই'। অন্যদিকে দেশবিভাজনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাল নিয়ে 'খোয়াবনামা' সাহিত্য সম্ভারের অসামান্য দলিল।

সাহিত্যকেন্দ্রিক কলকাতায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কয়েকটি ব্যতিক্রম উপন্যাস ছাড়া অতিবিজ্ঞাপিত পণ্যায়ন রচনা সম্ভার স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী হয়ে উঠে। তপোধীর ভট্টাচার্যের কথায়—

"সম্ভবত একে বাঙালির আত্মবিস্মৃতির অভ্রান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায়। ... পশ্চিমবাংলায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ক্রমশ গাঢ়তর হয়েছে নৈরাজ্য ও অন্ধকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চরিত্রবদল হয়েছে কিন্তু বিরল কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া ঔপন্যাসিকেরা স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির আয়ুধে পরিণত হয়েছেন। প্রতীচ্যের ধাঁচে 'উপন্যাস' অভিধা এখন

শাসিত হচ্ছে 'জনপ্রিয়' বিশেষণ দ্বারা। আর, জনপ্রিয়তার সহজ পথ হয়ে উঠেছে সার্বিক বিদুষণ : যৌনতা, সন্ত্রাস, বিকার, প্রকল্পনা, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির মাদকতাময় পাঁচন বিজ্ঞাপন, ধন্য হয়ে বিক্রয়যোগ্যতায় এখন সর্বাধিক।"

১৯৭১ সালে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজের চারটি পর্ব। প্রথম পর্ব 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' দ্বিতীয় পর্ব 'মানুষের ঘরবাড়ি', তৃতীয় পর্ব 'অলোকিক জলযান', চতুর্থ পর্ব 'ঈশ্বরের বাগান' এই উপন্যাসগুলিতে প্রাক্-দেশভাগ গর্বের পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, দাঙ্গাপটভূমি তার ভয়াবহ হিংস্র রূপ এবং দেশত্যাগের মিছিল ঐতিহাসিকের মূল্যবোধ চিত্রিত। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' (১৯৮১) উপন্যাসের বর্বরতার কাহিনির কালপটভূমি ১৯৩৫-৩৬ সাল, সাম্প্রদায়িক মনান্তর যখন বাঙালি সমাজে রীতিমতো জোরদার। সেইসঙ্গে তুলে ধরেছেন তার মানবিক মাত্রার দিকটিও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' (১৯৮৮) উপন্যাসে দেশবিভাজনের যন্ত্রনাদায়ক প্রসঙ্গ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পথে লোলুপ রাষ্ট্রনেতারা কিভাবে ব্রিটিশ শাসকের কুচক্রের ভেদবুধিকে আত্মস্থ করে নিয়ে নিজের দেশের মানুষকে ঠেলে দিলেন সর্বনাশের দিকে, তার এক বিশদ ও তথ্যানুগ চিত্র এঁকেছেন। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা' (১৯৯৬) বারো বছর বিনুর চোখ দিয়ে ১৯৪০ সাল থেকে শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, মহামন্বন্তর, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ গোটা পূর্ববাংলা গ্রাম সমাজের বিপর্যয়ের ইঙ্গিত আমরা পাই। এভাবে আমরা দেশভাগের অনেক পরে রচিত বিবিধ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে পাই— তসলিমা নাসরিনের 'ফেরা' দ্বিতীয় সংস্করণ (২০০১) আত্মকথনমূলক দেশভাগের স্মৃতিকথা; 'বিষাদবৃক্ষ' মিহির সেনগুপ্তের উপন্যাস ২০০৪ সালে অনুরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়। আমরা বাংলা সাহিত্যের দেশভাগের নির্মিত আখ্যান খুব সীমিত পরিমাণেই পাই। তারমধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যারা প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী দর্শক, তাঁদের হাতে দেশভাগের

উপন্যাস রচিত হয়নি। আর সাহিত্যকেন্দ্রিক কলকাতায় সাহিত্যগগনে বিরাজ করেছিলেন— তুলনামূলকভাবে নবীন কথাকার— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবী, সতীনাথ ভাদুড়ি এঁদের কাউকে দেশভাগের মতো বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনায় ব্রতি হতে দেখা যায়নি। এটা সত্যিকার অর্থে আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্যচর্চায় দেশভাগ ও গণভোটের কুচক্রান্তে শ্রীহট্টকে পূর্বপাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেওয়া বাঙালির মনে গভীর ক্ষত চিরদিনের মতো তৈরি করে দিয়েছিলো। বাস্তুচ্যুতি ও স্থানচ্যুতির জ্বালা মানুষকে শুধু বাক্‌শূন্য করে দেয়নি, গভীর জ্বালা নিঃস্ব জীবনের কোন আলোর সংকেত উদ্ভাসিত হওয়ার কোন বিন্দুও দেখতে পাচ্ছিল না। সন্তান হারা মা যেমন স্তব্ধ-চেতনহীন হয়ে পড়ে, তেমনি সহজ-সরলভাবে অতিবাহিত করা বাঙালি দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু পদবীর জ্বালায় সর্বহারা মানুষ সাহিত্য রচনার মহৎ কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেনি। আর পারেনি যন্ত্রণা-জ্বালা-সমাজ-সংস্কৃতি, মান-সম্মান হারিয়ে শুধু হতাশা কালিমাযুক্ত কু-রাজনৈতিক খেলার পশুর তান্ডব লীলা আগামী প্রজন্মের কাছে উপহার দিতে। আর আসামে বসবাসকারী মানুষের চরমদুর্গতীর সীমা ছিল না। একের পর এক বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছিল পিছন থেকে আরো একধাপ পিছনে।

বরাক উপত্যকায় স্বাধীনতার পরবর্তী ১৯৬১ সালে ১৯শে মে বাংলা ভাষার রক্ষার্থে প্রাণ দিতে হয় এগারো জন শহিদের। মাতৃভাষার এই নির্মম ইতিহাস সত্য ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন বাঙালির রাষ্ট্র স্বীকৃতি এই উপত্যকার মানুষের ফিরে যাওয়া ও ফিরে পাওয়ার যে প্রবল টান শুধু স্মৃতি গহ্বরে শুধু পিছু টানে। আসামের মাটি বিশ শতকের ষাট সত্তর এবং আশির দশকের প্রথমদিকে বাঙালির জীবনযাত্রায় বিভিন্ন আন্দোলন, রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাসম্পন্ন লোভী বর্বর মানুষের পাঠার বলি বাঙালি

জাতির জীবনে বাস্তুচ্যুতি এবং ছিন্নমূল হওয়ার নিষ্ঠুর বার্তা বারবার বয়ে নিয়ে এসেছে। অসমিয়া জনমানসের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বারবার বাঙালির অস্তিত্ব ধ্বংস ও হিংসার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই অস্থির দিনগুলোতে সর্বহারা বাঙালি জীবন বিপন্ন করে অসমিয়া ভেদবাদ উন্মত্ততার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। অনেকের প্রাণও বিসর্জন দিতে হয়েছে। এই রক্তক্ষয়ী ধ্বংসলীলা, বিদেশী তকমা শরীরে সেঁটে যাওয়া, শৈশবের জন্মভূমির আদর-ভালোবাসার পিছু-টান জন্ম নিল এক নতুন প্রত্যয়ের।

এই নতুন আশার প্রত্যয়ের ১৯৮০ দশকে বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ, স্থানচ্যুতি, ছিন্নমূলের মর্মবেদনা, দাঙ্গায় প্রিয়জনের বিচ্ছেদের আকুলতার করুণ ছবি প্রকাশ পেতে শুরু হল। দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরবর্তী দাঙ্গা, ধর্মান্ধতা-ধর্ষণ-গণহত্যা প্রেক্ষিত নিয়ে অঙ্গুলিমেয় উপন্যাস রচিত হয়েছে। সাহিত্যকেন্দ্রিক কলকাতার বাংলা সাহিত্যে যারা উজ্জ্বলতম ও সাহিত্যের উৎসে যাঁদের মন-প্রাণ নিবেদিত তাঁদের হাতেও মহাকাব্য উপন্যাস রচিত হয়নি। অঙ্গুলিমেয় কয়েকটি ব্যতিক্রম নিয়মের অমোঘতাকেই প্রমাণ করে। নাটকের মধ্যে আমরা পাই 'নতুন ইহুদি' ও তেমনি এক ব্যতিক্রমের মধ্যে ব্যতিক্রম পথের অনুসন্ধানী-ঋত্বিক কুমার ঘটক সামাজিক স্মৃতিলোপের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর 'কোমল গান্ধার', 'মেঘের ঢাকা তারা' ও 'সুবর্ণরেখা' বাঙালির দেশভাগের ও দেশত্যাগের অসামান্য শিল্পরূপ। প্রাবন্ধিক তপোধীর ভাষায়—

> *"চলচ্চিত্রে ঋত্বিক কুমার ঘটক ছাড়া অন্য কেউ দেশভাগের মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে আখ্যানবীজ হিসেবে মান্যতা দেননি।"*[৮]

আখ্যান সাহিত্যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ব্যতিক্রম অনবদ্য দেশভাগের

প্রেক্ষাপটে অনবদ্য উপন্যাস শেখর দাসের 'বিন্দু বিন্দু জল'। এই বরাক উপত্যকায় দেশভাগের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বড় মাপের কোন উপন্যাস রচিত হয়নি। যদিও দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা নিত্যদিনের সঙ্গী এতদঞ্চলে দ্বিজাতিতত্ত্বে বিভক্ত দেশভাগ তার ফল স্বরূপ সংখ্যা গরিষ্ঠ আরেক ভাষাবাহী মানুষের কবলে পড়তে হয়। ফলে কথাসাহিত্য গল্পে যে আখ্যান লেখা হয়েছে সেগুলি দেশভাগের পরবর্তী সময়ে দেশভাগ থেকে উদ্ভুত সমস্যা ও সংগ্রাম এই সমস্ত গল্পের আকর।

দেশভাগের প্রতিফলিত রূপ ও ছিন্নমূলের মর্মবেদনা গাঁথা গল্পকার তাদের গল্পে তুলে ধরেছেন। অমলেন্দু ভট্টাচার্যের 'ব্যোমকেশ কাব্যতীর্থের কড়চা' গল্পে আমরা দেখতে পাই স্থানে মান, অস্থানে অসম্মান, প্রবচন যা স্বাধীনতার মুক্তির স্বাদ তার কাছে বিষাদময় গরল টেকছিল। মলয়কান্তি দের 'আসরফ আলির স্বদেশ', দেবব্রত চৌধুরীর 'আব্বাজানের হার' গল্পে জন্মভূমি হারানোর জ্বালা— সেই জ্বালার উপর লবনের ছিটা 'বিদেশী' আখ্যায়িত হয়ে উৎখাত হবার আশাঙ্কার সম্মুখীন হওয়া অরিজিৎ চৌধুরীর 'আগুন' ও অমিতাভের 'ঘুমভাঙানিয়া' গল্পে সর্বহারা মানুষদের নতুন করে হারানোর ভয় লুপ্ত হওয়া ফলে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নতুন দেশ বাসভূমিযোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অর্ন্তদাহ ভালো-মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গল্পের বয়ন।

দেশভাগের দাঙ্গায় অসহায় স্বজনহারা ছিন্নমূল মানুষের বেঁচে থাকার যে ইতিহাস 'বিন্দু বিন্দু জল' জানুয়ারি ২০০৪ সালে শেখর দাশ বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন। এই উপত্যকায় দেশভাগের উপর সার্থক উপন্যাস এর আগে রচিত হয়নি। দেশ বিভাজনের মতো বিরাট আঘাত মানুষের জীবনযাত্রা সহজ-সুন্দর হয়ে আসতে না আসতেই ১৯৬১ সালে ১৯শে মে ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে দিয়েছিলো। জাতীয় সমস্যা, জীবনের জটিলতা,

উপন্যাসোপযোগী পটভূমি ও আখ্যান এই উপত্যকায় ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পালাবদল ও মিডিয়া আক্রান্ত, সাহিত্য বিঘ্নিত-বিঘ্নিত মানবায়ন। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও একদিকে বরাক উপত্যকার কথাসাহিত্যিকদের বৃহত্তর বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিল তেমনি। তাঁদের মনে জন্ম নিল নতুন অস্তিত্ববোধ। বর্হিজগতের ও অর্ন্তজগতের টানাপোড়েনের মধ্যে চিন্তাশীল মনন নিবিষ্ট করতে পারছে না বলেই বরাক উপত্যকায় দেশভাগের করুণ নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে সমস্ত বাঙালিই ভুক্তভোগি, কিন্তু তার উত্তরস্বরূপ উপন্যাস ক্ষীণ ধারায় বহমান।

আমাদের দেশজ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিন্দুসম ফাটল জীবনের সমাজ সংস্কৃতির-সাহিত্যের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তা-পণ্ডিতবিজ্ঞগণ অনুধাবন করতে পারেননি।

হয়তো বা বাঙালি চাইছিল না সে যে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাড়িয়ে গেছে সেই বেদনা পুনরায় অনুভব করার দুঃসাহসিকতা তাদের হারিয়ে গেছে। কবির ভাষায়—

"কে চায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা
জাগিয়ে তুলতো।"

তাই তাদের লেখনী স্তব্ধ।

আমরা যদি ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখি তাহলে দেখব জার্মানি ইতিহাসের তৈরি গন্ডি পেরিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির টানে সম্মিলিত হতে পেরেছে। কূট-রাজনৈতিক, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন বিভাজন বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। ভৌগোলিক ছোট একটা রেখার চিহ্ন আজও মানুষের গভীরে থেকে একটা ক্ষত বহন করে যাচ্ছে দৃষ্টির অগোচরে। আমরা শুধু অনুতাপই করছি না। মনের সন্ধিক্ষণে নস্টালজিয়া আলো-আঁধারি প্রকাশ— একটু হোঁচট খেলেই

স্মৃতিচ্যুত বাঙালির লক্ষ-লক্ষ শুকনো ঘা রক্তে টলমল করে।

বিভক্ত বাঙালির জাতিসত্তা বিভাজনের ফলে বিচ্যুত হয়ে আজও সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি— শত চেষ্টা করেও। এ প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য দেশভাগের পীড়া ও যন্ত্রণা নিয়ে লিখেছেন—

> *"বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কিত অধ্যায়ে কয়েকজন বাঙালি নেতা যে ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছিলেন— তাতে রবীন্দ্রনাথ-দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের আদর্শ যেমন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তেমনি ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সাধারণ বাঙালি জনগণের বাস্তব অবস্থান ও উপেক্ষিত হয়েছিল। দেশভাগ বাঙালি জাতির আদিপাপ; আজও স্মৃতিচ্যুত বাঙালি উৎকেন্দ্রিকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি।"*[৯]

সুতরাং দেশভাগ আজও প্রাসঙ্গিক। অভিশাপের এই বিশ্বায়ণে দাঁড়িয়ে মানুষের বর্বরতা কমেনি। সম্পত্তি, আধিপত্য ক্ষমতালোভী কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বাঙালিদের আজও উদ্বাস্তু, বাংলাদেশী, ডি-ভোটার উপাধিতে চিহ্নিত করেছে। যা সকল ছিন্নমূল মানুষের ইতিহাসে আজও প্রাসঙ্গিক। 'বিন্দু বিন্দু জল' ২০০৪ সালে প্রকাশিত হলেও তা আজও সমসাময়িক।

'বিন্দু বিন্দু জল' উপন্যাসে শুরু হয় দেশভাগের ফলে সম্পন্ন গৃহস্থালি পরিবারে বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের পরম্পরার সুরবালা পরিবারের ভিটেমাটি ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত দিয়ে—

> *"প্রশস্ত উঠোনের তুলসী বেদির কাছে এলেন সুরবালা। বড় এক পিলানুজ আছে পাকা বেদিতে।*

আজ পরিপূর্ণ করে ভরলেন তেল, অন্যদিন এত তেল দিতে হয় না। ...

আজই তো এ ভিটের শেষ সন্ধ্যাবাতি। কত পুরাতন পুরুষানুক্রমের ভদ্রাসন।"

"কত জননী এখানে জন্ম দিয়েছেন বংশের ক্রম। হালকা শিশিরের মতো এসব ভাবনা সুরবালার ভেতর হিমানীপাত ঘটনা। ছোট্ট শ্বাস ফেলেন একবার। স্বল্প শঙ্কায় বারবার লক্ষ করছেন, যতটুকু তেল ভরা হল— সারারাত জ্বলে কাল ভোর অবধি জ্বলবে তো? ...

সুরবালা বললেন, যতক্ষণ জ্বলে জ্বলুক না। কাল এমন সময় আলো দেওয়ার কেউ থাকবে না এ বাড়িতে।

— কেন? অশ্বিনী কাকা তো থাকছে।

ম্লান হেসে সুরবালা বললেন, শুধু ও কেন, দশরত, পুতু ও থাকবে।

— তাহলে ওরা আলো দেবে না?

— ওরা কী আর তেমন করে আলো দেবে, যেমন আমি দিই। সেজদি দিতেন, তোর ঠাকুমা দিতেন, তোর ঠানদি দিতেন। এমন এরা দেবে না।"[১০]

এই ঐতিহ্য পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়ায় দুঃখ-যন্ত্রণার পরও সাজানো সংসারে ফিরে আসার অদম্য জিজ্ঞাসাও উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে আমরা লক্ষ্য করি। প্রিয় সাজানো বাগান থেকে নিজেকে দূরে রাখার উপলব্ধি মর্মান্তিক। দেশভাগের ফলে আপন বাসস্থান ও সাজানো বাগার হারিয়ে আসা বহু মানুষেরই সে একই মর্মকাহিনি। আমরা এই উপত্যকার গল্পকারের আখ্যানে ও ভিটেমাটি ত্যাগ করার যন্ত্রণাময় বাক্‌রুদ্ধ অশ্রুর করুণকাহিনি দেখতে পাই। যা বাঙালির মননে দেশভাগের ক্ষত কতখানি যন্ত্রণালব্ধ তা প্রকাশ পেয়েছে। তা যেন পাঠকের মন ফাকা থেকেই যায়। অন্তত যারা প্রবল উপলব্ধিসম্পন্ন কথাকারদের লেখনীতে দেশভাগের নিদারুণ, জ্বালার পরিণাম লক্ষ্যণীয়। আর তার আদি পাপ থেকে কেউ মুক্তি পায়নি। সাতচল্লিশের ঝলসানো তাপ মানুষের মনে এখনও ছ্যাঁকা দেয় কারণ অনেক গল্পকারের ছোট গল্পে স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিকতার যুগকে ছাপিয়ে পিছনে ফিরে দেখার যে সহজাত বৈশিষ্ট্য তা থেকে গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্যও পারেনি নিজেকে সরাতে—

> *"পিতৃপুরুষের ভিটা ছেড়ে জ্যাটামহাশয়ও নারায়ণ শিলা গলায় ঝুলিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একবস্ত্রে সীমান্ত পেরিয়ে বারিদবরণের কাছে চলে এসেছিলেন। ... সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ... তারও আগে পূর্বপাকিস্তান ... তারও আগে শুধুই বাংলা।"* [১১]

দেশভাগের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল পূর্ব-বাংলার সমস্ত মানুষকে বিষাক্ত হওয়ার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। জন্মভূমির টানে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা, স্বপ্ন দেখা ও তাঁর প্রতি মমত্ববোধ মানুষের সহজাতবৃত্তি। আর তা ফিরে পাওয়ার আশাই এই দেশ-ত্যাগ। সুরবালা ও নলিনীর দুই ছেলে বরুণ, হারু এবং এক

মেয়ে পারুল সাজানো সুন্দর সংসার। মধ্যবিত্ত সংসারের স্বচ্ছ চিত্রপট পাঠকের পরিচিত সুন্দর কাছের পরিবার মনে হয়।

দেশত্যাগ করার আগে নলিনীর বসতভিটায় দশরথ দাদু, অশ্বিনী কাকা আর পুতুদাকে রেখে যাচ্ছে, লেখকের বয়ানে উঠে আসে এমন কিছু কথা—

"যতদিন টিকে থাকতে পারে দেখে শুনে রাখবে।
যদি ফিরে আসা যায় আবার এ আশায়।"[১২]

জন্মভূমির প্রতি নাড়ীর টান, সাজানো যত্নের সংসারে ফিরে আসার অভিলাশ— এখানে ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র বস্তুহারা মানুষের আশা সারাজীবনের প্রেম-ভালোবাসায় কষ্ঠের তৈরি জন্মভূমিতে ফিরে আসার।

উত্তাল রাজনৈতিক হাওয়া গণভোটের অনিয়ম ও সন্ত্রাস সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল। যা উপন্যাসে আমরা ভোটের ধর্মোমত্ততায় মগ্ন হয়ে মানুষের জীবন বিপন্নতার চিত্র দেখতে পাই। ভোটের রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে শান্তগ্রামের মানুষের জীবন সংকটময়।

বসুমতী আর দ্বিজেনের একমাত্র সন্তান রাতুলকে নিয়ে সুখী পরিবার। গণভোটের বিষাক্ত আঁচ এই পরিবারকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। গণভোটকে কেন্দ্র করে দেশভাগের দানবলীলায় কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কত মানুষের স্বপ্নের ঘর পুড়েছে, কত মানুষ লাঞ্ছনায় উন্মাদ হয়েছে, ইতিহাসে তাদের হদিশও নেই। দেশভাগের ইতিহাসের পাতায় এমন নির্মম চিত্র আর তাদের কষ্ঠের জীবন গাঁথা পুঞ্জীভূত করলে, তার ভারী ওজন কেউ আর বইতে পারবে না।

সন্ত্রাসের ত্রাসে বসুমতী পালিয়ে আসার সময় রাতুলের ভেজানো

পাশবালিশ কোলে নিয়ে পালিয়েছে সবার সাথে বাঁশ বনের দিকে। এ উপন্যাসের নির্মম কাহিনির বর্ণনায় শোচনীয় ভাগ্যবিড়ম্বনায় পাঠক হৃদয়ে বহুচর্চিত এবং লোকমুখে বহুপ্রচারিত। উগ্র হামলাকারীর হিংসার দাবানল জ্ঞানশূন্য আত্মার ধন সন্তানকে বিছানায় রেখে ওর পাশবালিশ কোলে নিয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে ছিল। কাহিনির মধ্যে শত শত মায়ের সন্তান-হারা বুকের কান্না সিক্ত ব্যথাকে প্রকাশ করেছে। ঔপন্যাসিক আখ্যানতত্ত্বের বর্ণনায়, প্রবল অনুভূতির আবেগও প্রয়োগে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট অভিজ্ঞতায় দেশ-ভাগের নগ্নচিত্রের সমসাময়িকতার এক আশ্চর্য প্রতিবেদন এ উপন্যাস।

ঔপন্যাসিক একবিংশ শতাব্দিতে দাঁড়িয়ে ১৯৪৭ এর দেশভাগের বাস্তুচ্যুতি ও স্থানচ্যুতির জ্বালার পাশাপাশি সন্তানহারা মাতৃহৃদয়ের চিরন্তনীয় হাহাকার লেখক সত্তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণেই বাস্তব ও হৃদয়স্পর্শী কাহিনি লিপিবদ্ধ করে পাঠক হৃদয়ে গভীরতর দাগ কাটতে সাহায্য করেছে। বলাবাহুল্য পাঠকচিত্তে যেন লক্ষ লক্ষ মায়ের সন্তান হারানোর গভীর শোকছায়া স্পর্শ করে। ১৯৪৭ সালের ভয়াবহতার জীবন্ত চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এ উপন্যাসে দুটি কাহিনির মধ্যে বসুমতীর কাহিনিতে দেশভাগের সর্বহারা নারীসত্তা কি ভাবে পূর্বে ও পরে কালিমাযুক্ত সময়ে নির্যাতিত হয়েছে— তারই আখ্যান।

স্থান-কাল-সমাজ পারিপার্শ্বিক জীবন চলার পথে সবকিছু হারিয়ে স্বামী-সন্তান হারা 'সীমাহীন নিঃস্বতায়' প্রায় মনোবিকলন বসুমতী। পাড়ার দেওর সম্পর্কিত ভবেশ শুধু জানে রাতুল আর দ্বিজেনের মর্মান্তিক মৃত্যুর দৃশ্য। মাতৃহৃদয় সর্বনাশা হত্যার নিদারুণ চিত্র চোখের সামনে দেখে ও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, বসুমতীর সংসার দেশভাগের উত্তাপে শেষ হয়ে গেছে। আর এভাবে

হাজার হাজার সংসার সন্ত্রাসের অস্ত্রে, প্রতাপ ও শারীরিক বর্বর আচরণে জীবন্ত মানুষদেরকে শ্মশানের শবে পরিণতি করেছে। 'স্ব-ভূমি' কবিতায় সঞ্জয় চক্রবর্তীর দেশভাগের লজ্জাকর হৃদয়বিদারক ধ্বংসের অন্তরলীলা আজও পাঠক হৃদয়ে নির্মাণ করে সেই জটিল সময়ের স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী আধিপত্যবাদীদের শোষিত রূপ।

"এই যে পদান্তরিত হয় মূল, তার ছিন্নভিন্ন নিয়ে
সে তো ইতিহাসের এক অনতিক্রম ছায়া অনদিকাল থেকে
পিছু নিতে নিতে, ওই তো দৌড়তে সর্বকালের, তার ঘনশ্বাস,
ক্রন্দন, তার স্বেদস্রোত, অসহায় চোখ ওই তো অগ্নিআঁচড়
শরীরে, এক স্তূপ গেরস্থালির ছাই ওই তো রাত্তিসমেত ..."[১৩]

সহস্রমানুষের ভিড়ে পুত্র শোকে উন্মাদ বসুমতী 'জলের স্রোতের সাথে যেভাবে খড়কুটো ভেসে যায় তেমনি ভেসে যায় দ্বিজেন আর রাতুলের অপেক্ষায়'। সবুজ সুন্দর প্রকৃতি ঘেরা বাংলা তখন হিংসার রক্তে লালে-লাল, কোথাও নিরাপদ আশ্রয় নেই। হিংসার দাবানলে ভৈরব পোলের ট্রেনে অসহায় নিরীহ মানুষকে শুধু দ্বি-জাতিতত্ত্বের অন্ধের কু-প্রথায় অন্যভাষী মানুষকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। শতশত শান্তিপ্রিয় মানুষের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে বসুমতীর স্থান হলো নতুন মাটি, নতুন জল, নতুন আকাশ, এক নতুন অপরিচিত ভূগোলের ক্যাম্পে। এখানে রিলিপের বাবুরা বসুমতীকে জিজ্ঞেস করলে তোমরা কতজন, উত্তরে পূর্বের জ্ঞানলব্ধ আধারে— তিনজন এবং ওরা পেছনে আসছে, বলে ভারসাম্যহীনতার পরিচয় দেয়।

বসুমতীর সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় নির্মম হিংসা উগ্র কোলাহলে পিতৃহৃদয় দ্বিজেনকে ছুটে যেতে হয় রাহুলকে ফিরিয়ে আনতে। আর তার চোখের সামনে ক্ষুদ্র গ্রাম জ্বলে শেষ হয়ে যায়, হত্যার তান্ডবলীলা মুহূর্তের

মধ্যে শশ্মানে পরিণত করে।

> *"অতএব, মানচিত্র ভাড়াটে জল্লাদ কাটল কাঁচি দিয়ে। আর ভেঙে সব বাঁধ গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত নাচার জাদুতে নামল সে ম্যাপটির শরীর থেকে গম্ভীর, জটিল, হিংস্র, মহামারী রূপে কাঁচির হৃদয় থেকে, বৃষ্টিবিন্দু থেকে লক্ষ ফোঁটা ঝরে গেল সময়ের শাপে।"*[১৪]

এ কোন স্বাধীনতা? যাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় অন্য দিকে বাঙালিদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার কালো স্মৃতিতে ঢেকে দিল প্রজন্মের পর প্রজন্ম। বাঙালির মানসে আজও বংশপরম্পরায় জন্মভূমির প্রতি আত্মার টান, ফিরে পাওয়া আশা-আজও বুকে বাসা বেঁধে আছে।

'বিন্দু বিন্দু জল' উপন্যাসে বসুমতী চরিত্রকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বাঙালি নারীর শিকড়-সন্ধানী দৃষ্টিকোণ এবং শাশ্বত মাতৃহৃদয়ের নির্মম ইতিহাস। নিম্নবর্গের মানুষের স্থান-কাল-জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়েও বাঁচার আকুল প্রচেষ্টা। স্বামী, সন্তান তার কাছে কেবল অবচেতন মনে স্মৃতি হয়ে থাকে৷ ঠিকানাহীন বসুমতীর অসহায় ও মনোবিকৃতির সুযোগ নিয়ে অস্থির-পরিস্থিতির আধিপত্য-লোলুপতা কীভাবে অমানবিক করে তোলে উপন্যাসে তার নগ্ন রূপ ফুটে ওঠে৷ দেশভাগের দাঙ্গায় গ্রামের সাধারণ দরিদ্র মানুষের নিষ্প্রাণ চিত্র ও তাদের সংগ্রাম, জন্মভূমিকে ত্যাগ করার বেদনা ও হাহাকার শেখর দাশ এ উপন্যাসে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন—

> *"অন্ধকার বর্ষার রাতে নির্দিষ্ট কোনো পথ না পেয়ে*

বনবাদাড় হাতড়ে যারা প্রাণের ভয়ে ছুটে যায় নিরাপদ সীমান্তের দিকে তাদের দুর্গতি কতটুকু, যারা এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি, তাদের কাছে অনুমিত হবে না কষ্টের ঘনত্ব।"[১৫]

স্বামী-সন্তানহারা পাগল বসুমতী হারিয়ে যায় ভিটেমাটিহীন এক বিশাল উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর ভিড়ে। সর্বহারা নিঃসহ দুর্বল উন্মাদ বসুমতীকে নির্যাতিত হতে হয় বটগাছের নিচে। ঔপন্যাসিক তাঁর লেখনি ক্ষমতার দক্ষতায় এমন এক নির্মম দৃশ্য অঙ্কন করেছেন যে পাঠক সে সময়ের নারীর পরিসর সহজে চিনে নিতে পারে।

বাস্তুচ্যুত বসুমতী ভাষিক-ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যেই হোক না কেন পশুর চেয়েও চন্ডালের মুখোশ পড়ে আদিম পুরুষের বর্বরতা বার বার ক্ষত হয়েছে। আর তার অজস্র নির্যাতনের কিছু দুঃখের সাক্ষী হয়ে পাশে দাঁড়ায় সাত বছরের নামহীন এক 'বরাহের বাচ্চা'।

লেখকসত্তার বয়ানে উপন্যাসের অন্তঃস্বরে সামাজিক চিত্রে তৈরি করে নিচ্ছে বহুস্বরিক সময়ের আখ্যান। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে বসুমতী ও নামহীন ছেলের জীবনবোধ ও পরিস্থিতি সমাজের নিম্নতম সোপানের যে ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি— তা বৃহত্তর ক্ষত-বিক্ষতের বিন্দুসম ছোট্ট একটি কাহিনি বিশেষ। সময়বোধ ও সমাজের গভীরে যে অসুখ গাঁথা হয়ে আছে ঔপন্যাসিক যেন সেই ক্ষতে আহত, কঠিন সংগ্রামের বহু প্রজন্মের ক্লেদ-বাস্তব ও রূপকের দ্বিরালাপ। যাযাবর জীবনে বসুমতী শুধু নতুন জায়গা নতুন নির্যাতনের আখ্যান তৈরি করে—

"ওখান থেকে তাড়া খেয়ে শিব বাড়ির টঙিতলা। টঙিতলা চারদিক খোলা। শিবের চোখের সামনেই

কোনো কোনো রাতে ওকে ছারখার করে দেয় বয়স্ক মানব পশু।"[১৬]

ঔপন্যাসিক স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে ছুঁয়ে গেছেন দেশভাগের ফলে নারী নির্যাতনের ঘৃণ্য চক্রান্তের দিকটিকে৷ বসুমতী শুধু সেই উত্তাল রাজনীতির এক ফোঁটা বিন্দু জল মাত্র। বাংলার বুকে বসুমতীর মতো বিন্দু বিন্দু নারীর আখ্যান জুড়ে সমুদ্রে সৃষ্টি কথাকারের অন্বিষ্ট। তার জীবন যুদ্ধের বয়ানে অস্তিত্বের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মাত্রা উদ্ভাসনই লেখকের অভিপ্রায়। বিকৃতি বসুমতির বয়ানে লেখকসত্তা অতি যত্নে গড়ে তোলে জীবন্ত ও সমসাময়িক সংগ্রামী জীবন। ইতিহাসের মারাত্মক অসংশোধনীয় বিভাজন কেউ সংশোধন করতে পারে না। ছেড়ে আসা প্রিয় স্মৃতি শুধু জীবন-ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতায় ফিরে আসে—

"অস্পষ্ট ঝাপসা ঝাপসা চোখে ভাসে— বিস্তীর্ণ ক্ষেত৷ ক্ষেতে ধানকাটা শেষ। ধানের গোছা স্তুপাকার নিকানো উঠোনে। শীত কাতর কেউ আগুন জ্বেলে দিয়েছে পোয়ালে। পোয়ালের পোড়া গন্ধে মিঠে সুবাস। আর কিছুই মনে পড়ে না।"[১৭]

উপন্যাসের শেষে নারীসত্তার উর্ধ্বে মাতৃহৃদয় সময়ের দহন পর্বের মধ্যে দিয়ে সেই আস্তিক বোধে উত্তীর্ণ হলো। ভূজঙ্গের অমানবিক আচরণে বসুমতীর তীব্র প্রতিবাদী আচরণ—

"স্তনে হাত দিতেই পুরানো বোধ চেতন হয়তো ফিরে আসে উন্মাদিনীর। কষে চড় মারে ভূজঙ্গের গালে। ভয়ে দয়াময়া হাওয়ায় মিলায়।"[১৮]

শোষিত, নির্যাতিত নারীর বড়ো তীব্র শাণিত প্রতিবাদ— তা আসলে

লেখকসত্তা জড়তার বর্বরতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবানল।

জীবনের নির্মম ভাগ্যের পরিহাসে বসুমতীর নারীসত্তাকে বার বার কামুক কালো হাত মর্মান্তিকভাবে ভিতরে ও বাহিরে শুধু যন্ত্রণার দাবানল ছড়িয়ে দেয়। সময়ের অমেয় শূন্যতা ও পরিসরের অন্তবর্তী রিক্ততা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে জীবনের নতুন কোন উৎসের বিন্দু পরিলক্ষিত হয় না— তখন ব্যক্তিগত অবচেতনার নির্দেশে খুঁজে পায় হারিয়ে যাওয়া রাতুলের উপলব্ধি। দেশ-কাল-সমাজ নির্বিশেষে শুধু হারানোর হাহাকার রক্তের ভিতরে খেলা করে অপ্রাপ্তি ও ব্যর্থতার উর্ধ্বে অর্জন করতে শিখে নেয় নিরবচ্ছিন্ন দ্বিবাচনিক পরিসর। বালকের জন্মদায়িনীর মাতৃদুগ্ধের কিছুটা অঙ্গুলি তুলে ধিক্কার জানায়। ভাষাহীন কুটিল সমাজের ভারবহন করে মাতৃসত্তা বসুমতীকে রমণীর সহজাত বোধও জাগিয়ে দেয়— "সাবধানে পালা। তোর পা ভারী আছে।"[১৯] প্রতিটি বর্তমান আকরণে প্রচ্ছন্ন থাকে অতীত ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিসত্তা জীবন-যাপনের ঘাত-প্রতিঘাতে উন্মোচন করে নিচ্ছে সামাজিক সত্তার পরিসর নানামাত্রিক বাস্তবতায়। এভাবে শেখর দাশ বসুমতী চরিত্রে সম্পূর্ণ জীবনের ছায়াপাত অঙ্কন করে পৃথিবীর বিচিত্র রূপের আখ্যানে মায়াবী ঘ্রাণ খুলে দেয় অপর সত্তার—

> *"বসুমতী সাবেক চেতনা ফিরে আসে, আবার মিলিয়ে যায়। আর এভাবেই ভাসা ভাসা অবচেতনায় ছুটন্ত বালকের হাত ধরে, তাড়া দেয় বসুমতী। রাতুল, জোরে ছোট্‌রে বাবা।"*[২০]

'বিন্দু বিন্দু জল' উপন্যাসে দেশভাগের চরম নিষ্ঠুর অমানবিকতায় প্রধান কাহিনি সুরবালা আর নলিনীর দুই ছেলে বরুণ, হারু আর একমাত্র মেয়ে পারুলকে নিয়ে। সুখী পরিবারের সহজ-সরল ছন্দ কিভাবে হারিয়ে যায় জীবন থেকে তারই কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের বাস্তব আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়

জীবন ও সংগ্রামের দ্বিবাচনিকতায় স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার সেতু বন্ধুনের সার্থক শিল্পরূপ এ উপন্যাস।

কাহিনির শুরুতেই কেন্দ্রীয় চরিত্র সুরবালা সন্তাদের নিয়ে নিরাপদ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা, আদুরে সন্তান পারুলের জীবন দিয়ে রচিত হবে— জানা ছিল না। স্বামী নলিনী অবস্থা সম্পন্ন পেশায় ডাক্তার। বাল্যকালের বন্ধু বচিত আলী সুখে-দুঃখে বিশ্বাসী মানুষ। বর্বর সম্পদলোভী হেমান মানুষ দাঙ্গার সুযোগে নলিনীর জীবন বিপন্ন করে তোলে। দেশভাগের দাঙ্গায় প্রাণের ভয়ে সাজানো সংসার ছেড়ে সবার আগে দেশছাড়া হয়েছিল। দেশভাগের আদিপাপ কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন করে দিশাহীন পথে ধাবিত করেছিল। তাই শেখর দাশের আত্মমন্থনে ধরা পরে সময়ের দহন পর্বে জীবনের তাৎপর্য কত অনেকান্তিক—

> *"জীবন কাকে কোথায় কখন, কীভাবে ঠেলে দেবে, কেউ আঁচ করে না। করলে পৃথিবীর কোথাও কেউ কোনোদিন উৎখাত হত না। উৎখাত হতে হতেও আশা রেখে যায়, আবার স্বভূমিতে ফিরে আসবে। নলিনীর এমনি ভাবনা।"*[২১]

দ্বিজাতিতত্ত্বে বিভক্ত হলেও সত্যিকারের মানুষ পাশে দাঁড়ায়। সহানুভূতি আর আশার প্রদীপ মনে জ্বালিয়ে এভাবে মুসলিম বাচিত আলী হিন্দু নলিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

> *"বাচিত বলেছিল, বৌঠান, বরুণ হারু, পারুলমাই-র কথা ভাইব না। আমি থাকতে তাগো গায়ের লুম কেউ ছুঁইবার পারবে না। আল্লার নামে কথা দিলাম। এক মুসলমান জান দিব, কথার খিলাফ করব না।*

ইনশা আল্লা।"[২২]

সম্পূর্ণ উপন্যাসে দেশভাগের জন্য তাড়িত মানুষের জীবন-আশা-স্বপ্ন উপলব্ধি ভ্রান্ত রাজনীতির পাশাখেলার কোটি কোটি হৃদয় পরাজয়ের আক্ষেপবাণী ঝলসে দেয় ইতিহাসের পাতাকে। 'আমি আবার আসব' কাব্যময় দ্যোতনা জীবনানন্দের সবুজ-সুন্দর-নদীমাতৃকার বুকে মৃত্যুর পরেও যে কোনো রূপে বাংলার বুকে বার বার ফিরে আসতে চেয়েছেন, বারো বছরের পারুলের বয়ানেও ধরা পরে সেই গভীর আবেদন। চঞ্চল-সরল-দামাল বুদ্ধিদীপ্ত পারুলের আকাশ জুড়ে শুধু প্রেম-প্রীতি। আর বাড়ন্ত স্বপ্নের ঝুড়ি নিয়ে বাড়ন্ত গাছকে থমকে দিল সেই আদিপাপ। কিশোরীর অবলীলায় জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার বেদনাও ফিরে আসার যে অদম্য ইচ্ছা— সরলতা তা লেখকের বয়ানে ব্যক্তিসত্তাকে নির্মাণ করে—

> *"... আবার যখন ফিরে আসব, এই চিহ্নগুলো দেখে দেখেই পথ চিনতে হবে। না হলে ফিরব কী করে? তোমরা কিচ্ছু বোঝো না। মেঝদার মাথায় ফুটবল ছাড়া কিচ্ছু নেই। এখন বুঝলে তোমরা, কেন ভেঙে ভেঙে সব ফেলে দিচ্ছি পথের পাশে?"* [২৩]

এভাবেই অগণিত মানুষের ক্ষীণতম আশা হৃদয়ের গভীর আকাঙক্ষার হাহাকার নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় সময়ের অতল গহ্বরে। সেই "মেঘনার পুলে রেল গাড়ি থামিয়ে নির্বিচারে হত্যা করছে নিরীহ লোকজনকে হামলাকারীরা। কেটে কেটে পুল থেকে মেঘনার জলে ফেলে দিয়েছে খণ্ডিত দেহ। রক্তে লাল। চুঁইয়ে পড়ছে রেলের বগি থেকে মানুষের শান্তিপ্রিয় বিন্দু বিন্দু রক্ত।"[২৪] ধ্বংস আর মৃত্যুর বিভৎস রূপ সেদিন বাঙালির চিন্তা-ভাবনাকে স্তব্ধ করে দিয়ে চিরদিনের

হারানো আর ফিরে পাওয়ার দোটানায় মূলের দিকে আকৃষ্ট করে।

ঔপন্যাসিক একটা সময় বা কালকে ধরে দেশ-জাতির ইতিহাস ব্যক্তিগত উপলব্ধির সুস্পষ্ট তুলিকায় জীবনদর্শন রূপায়িত করে। "আবহাওয়ার গড় তাপমাত্রা দিন দিন বিন্দু বিন্দু করে বাড়ছে। দুটো মেরুর বরফ গলার মাত্রাও বাড়ছে। বিন্দু বিন্দু করে সাগরে পরিণত হয়"[২৫] এমনি ভাবে। ঔপন্যাসিকের 'বিন্দু বিন্দু জল' নামকরণও সার্থক কারণ, সমুদ্ররূপী দাঙ্গা-সমস্যা-বৃহত্তর সামগ্রিক রূপ লেখনীতে তুলে আনা অসম্ভব। দেশভাগ জনিত পাত্র-পাত্রী, কাহিনি, চরিত্র নানা বাস্তব সমস্যা বিজড়িত বিন্দু বিন্দু জল নামে মাত্র তুলে ধরলেন। আর তিনি কৌশলেই ছেড়ে দিলেন পাঠক মহলে যে দেশভাগের ফলে ছোট ছোট জীবন গাঁথার রূপ এত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক হতে পারে, তবে সামগ্রিক রূপের ভয়াবহতা অকল্পনীয়, অবর্ণনীয়।

> *"উপন্যাসই বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত শিল্প পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সমস্ত রকম বৈচিত্র্যের সুযোগ আছে। ঔপন্যাসিক যদি নিজস্ব পদ্ধতিতে একটি বিশিষ্ট ও বিশ্বাস্য জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন এবং সেই জগতের মধ্য দিয়ে নিজের পরিণত দর্শন ও অনুভবকে পাঠকের মনে সঞ্চার করতে পারেন তবে তিনি নিশ্চয় শিল্পী।"*[২৬]

সমাজ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কোনো ধরনের শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে না। সমাজ সচেতন ঔপন্যাসিক বিশেষ একটা সময় বা কালকে ধরে বৃহত্তর পটভূমি খুঁজে নেয় উপন্যাসে। 'বিন্দু বিন্দু জল' বৃহত্তর পটভূমি দেশভাগকে ভিত্তি করে ঔপন্যাসিক বিশিষ্ট ভাষার আধারে লেখকসত্তার দৃষ্টিভাবনা তুলে ধরেন। সন্ত্রাস দাঙ্গায় মানুষের জমি জেরাত কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত নির্মম

আচরণ, যদিও উপস্থাপনার ভঙ্গি এবং ভাষা-বয়ন অনেকখানি নতুন। শেখর দাশের নিজস্ব ভাষা শিল্প প্রয়োগে সাহিত্য জগতে স্বতন্ত্র্য ছাপ লক্ষ করা যায়। 'এই বাচিত যখন উৎকণ্ঠায় বলে নলিনীকে তোমারই লোক লাগছে তোমার পিছে। এই ডামাডুলে সুযোগ লুইতে চাই কত হেমান।

"জেগা-জমিন বড় বেত্তমিজ, মাইনষেরে শয়তানের
আউলাদ বানায়।"[২৭]

ভাষা এবং লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা— দুটিই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে উপন্যাসে।

উপন্যাসে সুরবালা ও নলিনীর দাম্পত্য জীবন সুন্দর রূপায়িত নিটোল কাহিনির মোড়ক৷ এই কাহিনি লেখকের প্রবল অনুভূতি, সমাজচেতনার অর্ন্তদৃষ্টির আলোকে উন্মোচিত৷ ভাষা ও কাহিনিসমেত চরিত্রগুলো জীবন-জিজ্ঞাসায় ভিন্ন পথের যাত্রী। সুরবালা অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের ক্ষত বুকে চেপে রেখে জীবনের অমোঘ চলমান গতি তাকে পথ দেখায় অজানা ভবিষ্যতের দিকে। দেশ ছেড়ে যাওয়ার পথে ওলা ওঠায় পারুলের মৃত্যু হয়। সুরবালার সন্তান হারার বেদনা যেন লক্ষ লক্ষ মানুষের সন্তানহারার বেদনা ব্যথিত করে পাঠককে৷ সুরবালা-নলিনীর একমাত্র কন্যা ফুলটুসির মৃত্যু বাস্তব আর নস্টালজিয়া উপন্যাসের উপজীব্য। টুকরো-টুকরো সম্পর্কের ফুল দিয়ে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুরবালা একটি সম্পূর্ণ মালা গেঁথেছেন। স্বামী-স্ত্রীর হালকা মৃদু আলাপনের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের ছন্দ। গভীর প্রেম-ভালবাসার দ্বিরালাপে ব্যপ্ত জীব। শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে—

"এবার অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলেন নলিনী, রোজ রাতে
তোমার ঘুম হয়? আমার হয় না গো।

— জানি।

— কী করে জানলে তুমি? ...”

সুরবালা বললেন, একটু তফাতে অন্য বিছানায় একটা লোক প্রায় জেগেই থাকে সারারাত। কীভাবে আমি ঘুমাই বলো তো?”[২৮]

ফুলটুসি স্মৃতি ও পেছনে ফেলে আসা সেই দিনগুলি সুরবালার চলা পথের ইন্ধন হয়ে কাজ করে। ‘স্বপ্ন ছাড়া কী আছে জীবনে’? ব্যবহৃত কাব্যভাষায় জীবনের পরিসরকে বাড়িয়ে দিলেন বিচিত্র কৌণিকতায়। সুরবালা আর নলিনীর দ্বিবাচনিকতায় জীবনের ছন্দ সুর-তাল-লয়ে গাঁথা। ভাষা ও আবেগ ভিন্ন এক ব্যতিক্রম পরিসর তুলে ধরে, সময়ের সাপেক্ষে— যা পাঠক হৃদয়ে ভাব-আবেগ সঞ্চারিত করে।

“সুরবালা বললেন, বাঃ। মনে থাকবে না কেন? আমি ডাকি এখনও মনে মানে। নলিনী তাকালেন সুরবালার দিকে।

সুরবালার হাতে এখন সুচিকর্ম নেই।

নলিন বললেন— আমিও বলি গো।

— আমি জানি।

— তুমি জানো!

— হু।

— একবার বলো না নামটা।

যেন অপেক্ষায় ছিলেন সুরবালা। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, গলা কাঁপল, ফুলটুসি ফুলটুসি।

সুরবালা আবার বললেন, একেবারে চুপ হয়ে গেলে যে?

— একেবারে চুপ হয়ে গেলে বাঁচি। কিন্তু তোমায় ফেলে ...

নলিনীর কথা কাটলেন সুরবালা। ক্ষুন্ন হলেন, বললেন, আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না?

— তুমি যখন বলো তখন আমার কী হয় এবার বুঝেছ?

যেন বাবু করতে পেরেছেন সুরবালাকে তেমনি বালকসুলভ তৃপ্তির আভাস ফোটে নলিনীর চোখে মুখে।"[২৯]

তাদের কথোপকথনে চিন্তা-ভাবনায় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়ে একে অপরের পরিপূরক। নতুন পথের দিশারী। আর শত আঘাতে কষ্টে উত্তরণের সিঁড়ি যেন পেয়ে যায় সুরবালা। সংসার সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বার্থান্বেষী সম্পর্কের বিকৃতি রূপ আহত সুরবালা, তবুও সাজিয়ে নিতে চায় সংসারকে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শাড়িকে যেমন সুঁচ-সুতো দিয়ে সযত্ন সহকারে পরিধেয় করে তোলে, ঠিক তেমনি সম্পর্কের ফাটলকে প্রেমপ্রীতির মাধুর্যে সুন্দ্র করে রাখতে চায়।

ভেতরে ভেতরে পুরোপুরি ভেঙে গেলেন সুরবালা। আবার একে একে জুড়ে দিলেন অভ্যন্তরে। অন্তরে-বাহিরে পীড়িত সুরবালা জীবনের ছন্দ কখনও হারায়নি বা সংসারে কোনও রকম আঁচ পড়তে দেয়নি। উপন্যাসে তার যে

আবেগ, অনুভূতি, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙক্ষার যে পরিচয় পাই— তা সচেতন জীবনশিল্পীর সার্থক রূপ।

> *"স্পৃহা নিজেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, প্রয়োজনে ক্ষমাহীন ও কঠিন পারুলবালার মা সুরবালা, তর তর নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। সরলার মতো পল্‌কা অস্তিত্ব দাপট সইতে পারল না। সুতরাং কিছুই উচ্চারণ করতে পারলেন না জবাবে।"*[৩০]

সুরবালা পরিবারের বিভিন্ন স্বভাব ও বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানসিকতায় সামঞ্জস্যহীন ফাটলে 'ওর সূচিকর্মে নিপূণ মানসিকতা সব ছেঁড়া-ফোঁড়া যতটা পারা যায় জুড়ে নিতে চায়'। বিশ্বায়নের আগ্রাসন, আধিপত্যবাদের লম্বাহাত সমাজ-সংসার জুড়ে উৎকট ভোগবাদের সর্বাত্মক অভিব্যক্তি থেকে উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজ চলেছে অন্তর্বস্তুতে প্রকরণে। বর্তমানের চাকচিক্য, কৃত্রিম 'এ আলোর চেয়ে আঁধার অনেক ভালো' সুরবালার বহুমাত্রিক প্রতিবেদনে সচেতন ঔপন্যাসিক যেন সতর্ক ও সংবেদনশীল প্রতিবাদী।

'বিন্দু বিন্দু জল' উপন্যাসে দুটি কাহিনির মধ্যে প্রথম কাহিনির কেন্দ্রীয় ও সর্বাধিক সক্রিয় চরিত্র সুরবালা। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের প্রধান কাহিনির অন্যান্য চরিত্রগুলি আর্বতিত ও বিকশিত হয়েছে।

বিশ্বায়নের সুদূরপ্রসারী জাল এবং আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষের দ্রুত দৌড় যাত্রা মানব মনকে অবক্ষয়ী করে তোলে— ভিত্তিহীন দিশেহারা সময়ে দাঁড়িয়ে জীবনের মূল্যবোধ খুঁজতে গিয়ে শুধু যন্ত্রণা আর হারানো সুর চারদিকে রব তোলে। ঔপন্যাসিক, অতীত ক্ষতকে বুকে বেঁধে বর্তমানের প্রত্যেকটি নতুন মুহূর্তের মধ্যে ছাপ রেখে যেতে চান। আর সুরবালা চরিত্রটি দৃঢ়-স্থির প্রবল সহ্য

ক্ষমতার অধিকারী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ করতে যানে, তেমনি কানা কলসিতে জল ঢালা বৃথা'— সেই জীবনোপলব্ধি কখনও কখনও নলিনীকে তীক্ষ্ণস্বরে বলতে দেখেছি— 'যে নিজের বাপ-মাকে মান্য করে না, তাকে কেন বলতে যাও অযথা? যে যার যেমন চলে চলুক।'[৩১]

ছাপ্পান্ন বছরের উত্থান-পতনময় জীবন অতিবাহিত করে সময়ের গহ্বরে মিলিয়ে গেল সুরবালা। তাঁর জীবন সংগ্রামের দায়-দয়িত্বে, মায়া-মমতায় জীবনবোধের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সেই গ্রামের বাড়ির ঐতিহ্যকে বুকে আগলে রেখে আধুনিক সর্বগ্রাসের অন্ধকারের হাতছানিতে সংসার যখন মত্ত সুরবালা মৃত্যুর মুখে ঢলেও দায়-দায়িত্বের আকুলতায় বাঙালি নারীত্বের পরিচয় বহন করে আমাদের মনে—

> *"বড়ই অস্পষ্ট স্বরে সুরবালা বললেন, ন্যায় অন্যায় সব ভুলে যেও। তোমায় প্রণামও করতে পারলাম না। ...*
>
> *— বোধহয় চললাম গো। তুমি একা রয়ে গেলে।"*[৩২]

সুরবালা চরিত্র যেন রক্তে-মাংসে গড়া একজন দৃঢ় ব্যক্তিসম্পন্ন বাঙালি নারী। শত ব্যথা, শত আঘাত সহ্য করেও বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সংসারের প্রত্যেকটি মানুষের পাশেই। মানুষের মন একমাত্রিক হয় না। চলমান বাস্তবকে সামনে রেখে সুরবালা অতুল্য চরিত্রের অধিকারিনী হয়ে পৌঁছে যেতে চায় সময়োচিত আকরণে।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র নলিনী। পেশায় ডাক্তার। লেখকের জীবন-দর্শন, সমাজচেতনার অর্ন্তদৃষ্টির আলোকে উন্মোচিত নলিনীর ব্যক্তিসত্তা। নলিনী সংবেদনশীল মানবদরদী, পিতৃহৃদয়ের গভীর শোক সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত

হয়েছে উপন্যাসটিতে। সে একজন ডাক্তার। বাল্যকালের তৎকালীন দেশভাগের বিভৎস আবহাওয়া কূটনৈতিক চক্রান্তের প্রাণ রক্ষার্থে বাল্যকালের বন্ধুর সাহায্যে নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিল স্তন্য ভ্রাতা রজনীর কাছে। বাবার আহ্লাদী মেয়ে পারুলকে না দেখেই চলে আসতে হলো। সংসার-সন্তান বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে আসতেই 'নলিনীর মাথা মগজ চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হয় সাময়িক।' [৩৩]

পিতৃহৃদয়ের হাহাকার অবচেতন মনে পারুলের টুকরো টুকরো আনন্দের স্মৃতি অবলম্বন করে অপেক্ষা করে তাদের এবং সন্তানের চিন্তায় ঈশ্বরের কাছে আকুল আর্তি জানায়—

> *"মনে মনে বুক উজার করে বললেন নলিনী, ওদের সুস্থ রেখো ঠাকুর। আর কিছুই চাই না। রান্নাঘর থেকে বাসন কোসনের মৃদু শব্দ আসছে, সময় গড়ায়। নলিনীর একেকটা পল যেন এক একটা বছরের মতো। কত উদ্বেগ, অগণন চিন্তা।"*[৩৪]

উপন্যাসের নলিনী চরিত্র সামাজিকবোধ ও জাগ্রত বিবেকের অর্ন্তদহনে জীবনের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। নলিনীর সংকটময় জীবনে শুধু সিংহ রাশির এ সিঁড়ির প্রথম জেদি মেয়ের স্মৃতি যেন তার সত্তায় অভিনব অনুভূতির নিত্য সঙ্গী।

দিগরকোনা রেফ্যুজি ক্যাম্প থেকে বরুণের লেখা চিঠিতে দেশভাগের ফলে আশ্রিত ক্যাম্রে পারুলের মৃত্যুর কারণ বর্ণনাহেতু শতশত লোকের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিবেদন আমাদের সামনে ফুটে উঠে—

> *"তারপর লিখি— অশৌচের কারণ হইতেছে এই— আমাদের পারুলবালা গত পরশু রাত প্রায় শেষ*

প্রহরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সে ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়। তাহাকে বাঁচাইবার কোনোরূপ চেষ্টা করা সম্ভব হয় নাই। ঔষধ তো দূর, এক বিন্দু বিশুদ্ধ জলও দেওয়ার সংস্থান ছিল না। লোকে লোকারণ্য ক্যাম্প। কিছুই করার ছিল না।'[৩৫]

এ অভাবিত অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে তার চিন্তা-চেতনা অস্বাভাবিক ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মেয়ের মৃত্যুজনিত পিতৃহৃদয়ের হাহাকারের সাথে সাথে লেখকসত্তার দার্শনিকতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(১) 'নদীরস্রোত, পৃথিবীর ঘূর্ণনা আর সময়ের গতিশীলতার কোন বিরাম নেই।'

(২) 'সময় নিজের প্রয়োজনে সব তৈরি করিয়ে নেয় মানুষকে দিয়ে'

(৩) 'জীবনের পরতে পরতে কত যে তুচ্ছ গাঁথা লুকিয়ে চুরিয়ে জমাট বেঁধে রয়ে যায় দিনের পর দিন, আর গুমরায় নিজের মনে।

একটু উত্তাপ পেলেই সব গলে গলে বেরোয় গল্প হয়ে। এভাবেই মানুষের গল্প মানুষই কলম কালি ছাড়া লিখে দেয়—'

(৪) 'সাপের পুরনো ছাল খসে পড়ার মতো মূল্যবোধ ধীরে ধীরে খসে পড়ছে।'[৩৬]

(৫) 'নতুন এক শোক পুরাতন শোককে আজ আবার টেনে আনল ফুরিয়ে যাওয়া আলোহীন এই নিরালা ঘরে।'[৩৭]

মহাকালের প্রতিনিধি হিসেবে মৃত্যু অন্তরে-বাহিরে জীবনকে অজ্ঞাতসারেই

চালিত করে নতুন সূচনা বিন্দুতে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম সমাজের শ্রেণি বিন্যাস ও সামাজিক প্রতাপের আদল বদলে যেতে থাকে। ঔপন্যাসিক বাস্তবকে নিঙড়ে নিয়ে নলিনী ব্যক্তিত্বের মধ্যে জীবনের নির্যাস তাঁর যাবতীয় স্পন্দন ও কৌণিকতা একে একাকার। ব্যক্তি পরিসর ও হৃদয়ের নিবিড় গভীরতা থেকে কোন শোক যে অবচেতার অস্তিত্ব রয়েছে, তা লেখকসত্তাকে পথে থেকে পথান্তরে নিয়ে গেছে।

আর নলিনী চরিত্রের মাধ্যমে আধুনিক মনস্তত্ত্ব ভাবনা রূপায়িত করে ভবিষ্যত দ্রষ্টাও মননে বুদ্ধিমত্তায় লেখকসত্তার উপস্থিতিকে লক্ষ করা যায়।

ঔপন্যাসিকের অসাধারণ সৃষ্টি— নলিনী আর সুরবালা চরিত্র। সময় ও পরিসরের ঘটনা প্রবাহে শিল্প-কুশলতায় দ্বিরালাপের এক অপূর্ব নির্যাস। শত দুঃখ-কষ্টে বিপন্ন জীবনে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উপন্যাস বিবিধ সামাজিক বাস্তবে মানবিক প্রকল্পের বিচিত্র উন্মোচন—

> *"... নতুন দেশ, নতুন জল, নতুন মাটি বদলে দিল তোদের? তা কী করে হবে। ওদেশ থেকে তুলে আনা আমগাছ এদেশের মাটিতে রোপণ করলে জাম গাছ হয়ে যাবে? তাকি হয় কখনো? ফল না হয় কিছু কম ধরবে।"*[৩৮]

প্রচার সর্বস্ব যুগে দাঁড়িয়ে লেখক সত্তা নলিনীর সন্তান বরুণ ও হারু আর ছেলের বউ সরলা ও সাধনা আর নাতি-নাতনী বুম্ব ও তুলি চরিত্র অঙ্কনে লেখকসত্তা উন্মোচন করতে চান আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার বিচিত্র জটিলতার অসামাজিক অনুষঙ্গগুলি। দেশকালের বিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে উপন্যাসের বহুমাত্রিক রূপান্তর। সাম্প্রতিক সমস্যা সমাজের গভীরতম অসুখের তত্ত্বচিন্তা সহজ, স্বাভাবিক

ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সময় ও পরিসরে নিয়ত বির্বতিত হয়ে চলেছে। তাঁর সংসারে চরিত্রের আদলে লেখকসত্তা নাগরিক পৌর সমাজের জটিল দহনকথার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপুঁজিবাদের প্রতাপসর্বস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিপুল ভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে। এমন কী সম্পর্কের বন্ধনকেও স্নেহহীনতা পর্যবসিত করে তুলছে আধুনিকতার সর্বগ্রাসী হাত।

টুকরো টুকরো সম্পর্ককে একসূত্রে আবদ্ধ করে রেখে প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুরবালা। আর নলিনী আবিষ্কার করে পরিবারের সবচেয়ে প্রয়োজন জীবন উপলব্ধি, তার স্ত্রী সুরবালার মধ্যে— "হ্যাঁ গো" এই সুরবালা দেবীই পরিবারের সংহতির সুতো।'[৩৯] আর এ প্রতিবেদনে ফুটে উঠে পরিবার ও তার জীবনে সুরবালা নামক দেবীই জীবনবোধের গভীর পাঠে প্রত্যক্ষ ভাবে খনন করে আর অবচেতন মনে পারুলের মিষ্টি-মৃদুল স্মৃতি পথ চলার ইন্ধন হয়ে শক্তি জোগায়। আর এ কাহিনির শেষে নলিনীর বয়ানে জীবনতত্ত্ব নতুন ভাবে বিনির্মাণ করে আত্মজিজ্ঞাসার প্রকরণ—

> *"চোখে জল অথচ মুখে এক অদ্ভুত হাসি। যে হাসি চোখের জলের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি, মন-কেমন করা। কাপড়গুলো তোরঙ্গে ভরতে ভরতে একমনে বললেন নলিনী, থাকো তোমরা। মা আর মেয়ে একসাথে সুখে থাকো। এখানে আমি একা একা বেশ আছি।"*[৪০]

১৪-১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে স্বাধীনদেশ নামে যে স্বাধীনতা সাধারণ মানুষ পেয়েছিল তা বুকভরা কান্না আর জীবনের বিপন্নতা। ২০০৪ সালে প্রকাশিত 'বিন্দু বিন্দু জল' উপন্যাসে সেদিনের বুকভরা কান্না, ভিটেহীন মানুষের হাহাকার, সন্তানহারা মাতৃ-পিতৃ হৃদয়ে আর্তের কান্না আজও তেমনি পাঠকের

হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলে। স্বাধীনতা লাভের পর অনেকটা বছর কেটে গেছে। সচেতন পাঠক ঠাকুরদা-ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা সেই সব গল্পের করুণ কাহিনি যা আমরা 'বিন্দু বিন্দু জল' উপন্যাসে বসুমতী চরিত্রের মধ্যে উপলব্ধি করি। স্বামী সন্তান হারা জননীর হাহাকার বিলাপ আমাদেরকে ঠিক যেন সেই মুহূর্তের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী করে তোলে।

দেশভাগ মানুষের জীবনের অশান্তি, অস্বস্তি ধীরে ধীরে ঘোর অন্ধকারের হাতছানি অতল গহ্বরে ঠেলে দেয় পশুবর্বর আচরণে।

> *"একজন মধ্যবয়স্ক চেঁচিয়ে বলল, না, না, ওদিকে না। বন্দুক আছে ওদের। ওরা সংখ্যায় বেশি, অনেকজন হতে পারে। বাঁশ বনের দিকে দৌঁড়াও সবাই। যে যেমন পারো, ছিতরে পড়ো রে।"*[৪১]

'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান' এর লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার স্বপ্ন, তারমধ্যে চরম আঘাত আর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, স্বপ্ন, আশা, ভরসাই নিঃশেষ করে চরম অমানবিকতার ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস সৃষ্টি করল।

দেশভাগে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ হারিয়েছেন বিনাকারণে। এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত জ্বালা যা ইতিহাসের পাতা ভারি হয়ে যেত— তাই এদিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু সাক্ষী রইল লক্ষ লক্ষ মানুষের বলিদান। 'বিন্দু বিন্দু জল' উপন্যাসে পারুলের শেষযাত্রার যে চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তা শুধু অন্তরকে কাঁদায় না, দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। যা ভাষা-বর্ণ-শব্দে প্রকাশ পায় না— শুধু হৃদয়ের গভীর কান্নায় লজ্জা ও ঘৃণায় রাজনৈতিক সুবিধাবাদী বর্বর জন্তুর ক্রিয়াকলাপে আজ সর্বশান্ত সাধারণ মানুষ। তাদের আশা-ভরসা, প্রেম-ভালোবাসা কত চরার ধারে, কত রাস্তায়, ট্রেনে, জলে, ঘরে চিতা জ্বলেছে; তার

সাক্ষী হয়ে ‘বিন্দু বিন্দু জল’ এর পারুলের মৃত্যু-চিত্র।

দুই কাহিনির মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনের রূপ আমরা পাই। একটি জানালায় দূরবীন দিয়ে বিজ্ঞানীরা যেমন তাদের আকাশের সমস্ত গ্রহ-জগতকে দেখতে পায়; তেমনি ‘বিন্দু বিন্দু জল’ উপন্যাসে দুটি ছোট জীবনীর রেখাপাত অঙ্কন করে সামগ্রিক জীবনবোধের সার্থক পরিণতিতে নিয়ে গেছে। যাকে আমরা বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস বলে ধরতে পারি। এ উপত্যকায় যদিও আমাদের সীমিত উপন্যাস, তারমধ্যে অন্যতম ও ব্যতিক্রমী ‘বিন্দু বিন্দু জল’ উপন্যাসটি স্বতন্ত্র উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো পাঠকের কাছে ধরা দেয়।

তথ্যসূত্র :

১. এক ধরনের অহংকার, শামসুর রহমান, 'শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা', সুধাংশু শেখর দে, পৃঃ ১২২

২. উত্তরপূর্বের বাংলা কথা সাহিত্য : সম্ভাবনা ও সংকট, তপোধীর ভট্টাচার্য, 'অমৃতলোক : ৯৯' সমীরণ মজুমদার, পৃঃ ৯৮

৩. 'বৃষ্টি ধারা', শঙ্খ ঘোষ, 'শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা', সুধাংশু শেখর দে, পৃঃ ৭১

৪. দেশভাগ : সামূহিক স্মৃতিলোপের আখ্যান, তপোধীর ভট্টাচার্য, দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস, উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩

৫. 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা', শামসুর রহমান, 'শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সুধাংশু শেখর দে, পৃঃ ৮৭

৬. 'সম্প্রদায়ের বিভাজন এবং মিলনের পথানুসন্ধান', মফিদুল হক, দৈনিক সংবাদ, পারমিতা লিভিংস্টোন, শারদীয় ১৪১০, পৃঃ ৩৪

৭. গড়শ্রীখণ্ড : ইতিহাসের গভীরে, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ ও বাংলা উপন্যাস, পৃঃ ৩১৫

৮. চৌদ্দ শতকের বাংলা উপন্যাস, উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, তপোধীর ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩০

৯. দেশভাগ : সামূহিক স্মৃতিলোকের আখ্যান, তপোধীর ভট্টাচার্য, দেশভাগ-দেশত্যাগ, প্রসূন বর্মন, পৃঃ ৬৫

তদেব, পৃঃ ৬২

১০. বিন্দু বিন্দু জল, শেখর দাশ, পৃঃ ৭

১১. বাস্তুহীন, স্বপ্না ভট্টাচার্য, শতক্রতু নবপর্যায় : দ্বিতীয় সংখ্যা, মাঘ ১৪১৭ সাল, পৃঃ ১৪৮

১২. বিন্দু বিন্দু জল, শেখর দাশ, পৃঃ ৮

১৩. স্বভূমি, সঞ্জয় চক্রবর্তী, দেশভাগ-দেশত্যাগ, প্রসূন বর্মন, পৃঃ ৪৩

১৪. বিন্দু বিন্দু জল, শেখর দাশ

১৫. 'মৈত্রেয়-র কবিতা' অমিতাভ দেব চৌধুরি, দেশভাগ-দেশত্যাগ, প্রসূন বর্মন, পৃঃ ৩৩৩

১৬. বিন্দু বিন্দু জল, শেখর দাশ, পৃঃ ৩৯

১৭. তদেব, পৃঃ ৮৪

১৮. তদেব, পৃঃ ৮৫

১৯. তদেব, পৃঃ ৮৪

২০. তদেব, পৃঃ ৮৭

২১. তদেব, পৃঃ ১৮

২২. তদেব, পৃঃ ১৮

২৩. তদেব, পৃঃ ২২

২৪. তদেব, পৃঃ ২৬

২৫. তদেব, পৃঃ ৫৬

২৬. 'উপন্যাসের ভাষা', উপন্যাস জীবন ও শিল্প, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পৃঃ ১৩

২৭. বিন্দু বিন্দু জল, শেখর দাশ, পৃঃ ১৮

২৮. তদেব, পৃঃ ৪৭

২৯. তদেব, পৃঃ ৭৪

৩০. তদেব, পৃঃ ৫৩

৩১. তদেব, পৃঃ ৮০

৩২. তদেব, পৃঃ ৮১

৩৩. তদেব, পৃঃ ৩২

৩৪. তদেব, পৃঃ ৩৯

৩৫. তদেব, পৃঃ ৫৮

৩৬. তদেব, পৃঃ ৬০

৩৭. তদেব, পৃঃ ৬৮

৩৮. তদেব, পৃঃ ৭৭

৩৯. তদেব, পৃঃ ৮৩

৪০. তদেব, পৃঃ ৬৪

৪১. তদেব, পৃঃ ৮৩